Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-VII, Issue-II, October 2018, Page No. 24-32
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

জন্মশতবর্ষে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় : প্রসঙ্গ 'বৈতালিক'

ড. অভিজিৎ চক্রবর্তী
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, করিমগঞ্জ কলেজ, করিমগঞ্জ, আসাম

Abstract

Narayan Gangapadhya is one of the eminent writers in bengali literature in the 20th century. His popular novels are 'Upanibesh','Shilalipi' etc. He wrote not only novels but also a lot of short stories, essays and literature on children, drama etc.

He wrote one of his novels "Baitalic" which is rarely criticized. In this novels he depicted a conflict between subalterns and elite class. This novel was written on the basis of North Bengal. The core theme of this novels is a conflict between subaltern named Ruhidas's society and elite society. The purpose of this research paper is to discuss on the conflict between a subaltern and elite society.

(১)
জীবন ও সৃষ্টি

বাংলাসাহিত্যের একজন জনপ্রিয় কথাকার নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। পোষাকী নাম তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। 'সুনন্দ' ছদ্ম নামে 'দেশ' পত্রিকায় ধারাবাহিক 'সুনন্দর জার্নাল' রচনা করেন। বিংশ শতাব্দীর ১ম দশকে অর্থাৎ ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে তাঁর জন্ম। জন্মস্থান বর্তমান বাংলাদেশের দিনাজপুর জেলার বালিয়াডাঙ্গীতে। সাল তারিখের নিরিখে ২০১৮ ইংরাজি নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের জন্মশতবার্ষিকী বছর। জন্মের শত বছর পেরিয়ে এসেও নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় অমর হয়ে আছেন তাঁর সৃজনশীল লেখনীর জন্য। বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ঝর্ণা কলম উপহার দিয়েছে 'উপনিবেশ' 'মন্ত্রমুখর' 'শিলালিপি' 'অসিধারা' ইত্যাদি জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক প্রতিবেদন সমূহ।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা সাহিত্যে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হয়ে এম.এ.পাশ করেন। এবং পরবর্তীকালে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনায় যোগ দেন। দীর্ঘদিন তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছেন। তৎকালীন সময়ের বহু বিখ্যাত পত্র পত্রিকায় তিনি লিখেছেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল। 'শনিবারের চিঠি', 'বিচিত্রা', 'পরিচয়', 'পূর্বাশা', 'দেশ' 'চতুরঙ্গ', 'মাসিক বসুমতি', 'অমৃত', 'এক্ষণ' ইত্যাদি। বড়দের জন্য সাহিত্য রচনা করলেও শিশুসাহিত্যে তিনি সমান ভাবে কলম চালিয়েছেন, তাঁর 'টেনিদা' শিশুকিশোরদের মধ্যে বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। আজও টেনিদা কিশোরদের মধ্যে সমান জনপ্রিয়।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পগুলো বাংলা সাহিত্যের এক অমর সৃষ্টি। গল্পে তিনি বহুমুখী প্রতিভার ছাপ রেখে গেছেন। বিশেষ করে 'বীতংস' 'নক্রচরিত্র' ইত্যাদি গল্পে তখনকার সময়ের সমাজের নগ্নরূপকে তিনি পাঠকের সামনে নিয়ে এসেছেন।

গল্প নিয়েও অসাধারণ কিছু প্রবন্ধ গ্রন্থ তিনি রচনা করেছেন। তা থেকে বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যে তাঁর গভীর মননশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। এই অমর কথাসাহিত্যিক মাত্র ৫৩ বছর বয়সে ৬ নভেম্বর ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে পরলোক গমন করেন।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সৃষ্টিকর্মের একটি তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হল:

উপন্যাস:- (১) 'উপনিবেশ'-(তিন খন্ড) ১৯৪৪, (২) 'মন্ত্রমুখর' (১৯৪৫), (৩) 'স্বর্ণসীতা' (১৯৪৬), (৪) 'সম্রাট ও শ্রেষ্ঠী' (১৩৫১) (৫) 'সূর্যসারথী' (১৯৪৮) (৬) 'বৈতালিক' (১৯৪৮) (৭) 'ট্রফি' (১৯৪৯), (৮) 'বিদিশা' (১৯৪৯), (৯) 'শিলালিপি' (১৯৪৯), (১০) 'পদসঞ্চার' (১৯৪৯), (১১) 'লালমাটি' (১৯৫১), (১২) মহানন্দা (১৯৫১) (১৩) 'নিশি যাপন' (১৯৬০), (১৪) 'ভস্মপুতুল' (১৩৬২), (১৫) 'অমাবস্যার গান' (১৯৬৫), (১৬) সন্ধ্যার সুর (১৯৬৬), (১৭) 'পাতালকন্যা' (১৯৬৬), (১৮) 'নির্জন শিখর' (১৯৬৮) (১৯) 'তৃতীয় নয়ন' (১৯৬৯), (২০) 'কাঁচের দরজা' (১৯৭০) (২১) 'আলোকপর্ণা' (১৯৭০) প্রভৃতি।

গল্পগ্রন্থ:- 'বীতঃস' (১৯৪৫), 'দুঃসাশন' (১৯৪৫), 'ভাঙাবন্দর' (১৯৪৫), জন্মান্তর (১৯৪৬), ভোগবতী (১৯৪৭), 'কালাবদর' (১৯৪৮), 'শ্বেতকমল' (১৯৫১), 'গন্ধরাজ' (১৯৫৫), 'উর্বশী' (১৯৫৬), 'চারমূর্তি' (১৯৫৭), 'ভাটিয়ালী' (১৯৫৭), 'রূপমতী' (১৯৫৯), 'সাপের মাথার মণি' (১৯৫৯), 'একজিবিশন' (১৯৫১), 'শুভক্ষণ' (১৯৬১), 'রাতের মুকুল' (১৯৬৪)', 'শিলাবতী' (১৯৬৪), 'ছায়াতরী' (১৯৬৬), 'বনজোৎস্না' (১৯৬৯), 'ঘূর্ণি' (১৯৭১) 'লক্ষ্মীর পা' (১৯৭৭), 'অষ্টাদশী' (১৯৭৯), 'আলেয়ার রাত' (১৯৮১)।

কিশোর গল্প: (১) 'সপ্তকান্ড' ১৯৪৮, (২) 'ছুটির আকাশ' ১৯৫৬, (৩) 'খুশির হাওয়া' ১৯৫৮, (৪) 'গল্পবলি গল্প শোনো' ১৯৬১, (৫) 'রাঘবের জয়যাত্রা' (১৯৬৩), (৬) 'হনোলুলুর মাকুদা' ১৯৬৬, (৭) 'কম্বল নিরুদ্দেশ' (১৯৬৭), (৮) 'পঞ্চাননের হাতী' ১৯৬৪, (৯) 'টেনিদার গল্প' (১৯৬৮), (১০) 'পটলডাঙ্গার টেনিদা ১৯৭০, (১১) 'টেনিদা দি গ্রেট' (১৯৭১), (১২) 'ঘন্টাদার কাবুলকাকা' ১৯৭২, (১৩) 'অব্যর্থ লক্ষ্যভেদ' (১৯৭৪), (১৪) 'টেনিদা ও ভুতুড়ে কামরা' ১৯৮১, (১৫) 'ক্রিকেটার টেনিদা' ১৯৮৬, (১৬) 'টেনিদার কান্ডকারকানা' (১৯৯০)।

প্রবন্ধ গ্রন্থ: (১) 'সাহিত্য ও সাহিত্যিক' (১৯৫৬), (২) 'সাহিত্যে ছোটগল্প' (১৯৫৬), (৩) 'বাংলা গল্প বিচিত্রা' (১৯৫৮), (৪) 'কথাকোবিদ রবীন্দ্রনাথ' (১৯৬৬), সুনন্দর জার্নাল'; প্রথম পর্যায় (১৯৬৬), 'ছোটগল্পের সীমারেখা' (১৯৭০)।

নাটক:- 'রামমোহন', 'ভাড়াটে চাই' 'আগুন্তক' 'পরের উপকার করিওনা' 'ভীমবধ', 'বারোভূত'। (সূত্র:- https://bn.m.wikipedia.org/wiki)

(২)
প্রসঙ্গ: বৈতালিক

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের বৈচিত্রময় রচনাবিশ্বে 'বৈতালিক' (১৯৪৮) নানাকারণে অনন্য হয়ে উঠেছে। যদিও এ উপন্যাস সমালোকদের দৃষ্টি সেরকম ভাবে আকর্ষণ করেনি। একনিষ্ট পাঠক হিসাবে এই উপন্যাস যখন পুনঃপাঠ করি তখন বিস্মিত হই, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি কীভাবে সমাজের একেবেরে নীচু তলায় থাকা মুচি-সমাজের অন্তর্বেদনাকে ধরার চেষ্টা করেছে, এই ভেবে। চল্লিশের দশকে অস্থির রাজনৈতিক ও সামাজিক ভাঙাগড়ার ডামাডোল বিশেষ করে ১৯৪৭ সালের দেশভাগ ও স্বাধীনতালাভ এবং তার পরবর্তী সময়ে সৃষ্ট উদ্বাস্ত স্রোতকে নিয়ে বাংলা সাহিত্য যখন সরগম তখন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় নিম্নবর্গীয় সমাজের একেবারে নীচুতলায় থাকা মুচি সমাজকে নিয়ে কলম ধরলেন। শুধু ধরলেন না তাদের অন্তর্বেদনাকে তুলে আনার চেষ্টা করলেন। উচ্চবর্গীয়

মানুষদের দ্বারা অপমানিত, অবহেলিত, নিগৃহীত রুহিদাস সমাজের মর্মবেদনা 'বৈতালিক' উপন্যাসের মূল বিষয়। উপন্যাসের একেবার শুরুতে উপন্যাসের ঘটনার সময় সম্পর্কে লেখক বলেছেন,-

> *"বইয়ের ঘটনাকাল ১৯৩৪ সাল। যখন বাংলার বিপ্লব আন্দোলনের সমাপ্তি যুগ আর গণ-আন্দোলন আসবার পূর্বাভাস।।"*[১]

উপন্যাসের 'ঘটনাকালের' উল্লেখ থেকে উপনাসের বাস্তবতার দিকটি পরিস্ফুষ্ট হয়েছে বলা যায়। নিছক কাহিনি রচনার জন্য এ কাহিনি যে রচিত হয়নি তা পরিষ্কার। জাতপাতের দ্বন্দ্বে জর্জরিত বাংলার সমাজ জীবনের এক জীবন্ত প্রতিবেদন হয়ে উঠেছে 'বৈতালিক'।

উত্তরবঙ্গের পটভূমিকায় রচিত এ উপন্যাসে ভারতীয় উপমহাদেশের সমাজব্যবস্থায় দীর্ঘদিনের জাতপাতের গভীর সংকটকে তুলে ধরেছেন ঔপন্যাসিক। হিন্দু-সমাজের একেবারে নীচুতলায় অন্ত্যজ রুহিদাস (মুচি) সমাজের নিপীড়নের মর্মস্পর্শী এক জীবনচিত্র ঔপন্যাসিকের নিপুণ তুলির টানে জীবন্ত হয়ে ফুটে উঠেছে।

প্রতিবেদনের একেবারে শুরুতে ব্যঞ্জনাময় বয়ানে উপন্যাসের মূল সুর ধরিয়ে দিয়েছেন লেখক-

> *"ন্যাড়া মাটটায় ইতস্তত ছোপ ধরেছে সোনালি সবুজের, ফলেছে শর্ষে, কলাই, ছোলা, মটর। শীতের বিষন্ন শূণ্যতায় এতবড় শ্রীহীন মাঠখানার দীনতা ঢাকেনি বরং আরো প্রকট হয়ে উঠেছে মনে হয়। ভাঙাচুরো আল, মাটির ছোটবড়ো চাঙাড়, বিবর্ণ ঘাস, মরা মরা কণ্ঠিকারী আর টুকরো টুকরো গোরুর হাড়ে বিস্তীর্ণ হয়ে আছে শ্মশানের ইঙ্গিত। উত্তর বাংলার আদিগন্ত এক ফমলের মাঠ। এলোমেলো এই রবিশস্যের টুকরোগুলোর পেছনের কোনো সজাগ চেষ্টার ইতিহাস নেই।"*[২]

চিত্রধর্মী এই বর্ণনার মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে গভীর ব্যঞ্জনা। 'ইতিহাস নেই' অথচ এই ইতিহাসহীন ইতিহাসের প্রতিবেদন তিনি রচনা করেছেন। উচ্চবর্গের নিপীড়ন, উৎপীড়ন, বঞ্চনা, শোষণের এক করুণ সামাজিক ইতিহাসহীন ইতিহাস হয়ে ওঠেছে 'বৈতালিক'।

গুরুট্রেনিং পাশ মাষ্টার বংশী পরামাণিক মহেন্দ্র রুহিদাসের নামটা যতোই ঠিক করে দেওয়ার চেষ্টা করুক না কেন মহেন্দ্রের জিহ্বার আড়ষ্টতা অথবা দীর্ঘদিনের পুরুষানুক্রমে লালিত সংস্কার সে ছাড়তে রাজি নয়। ঔপন্যাসিকের বয়ান-

> *"আগে টিপ-সহি দিত, এখন কাঁচা কাঁচা অক্ষরে লেখে শ্রী মহিন্দর রুহিদাস। প্রাইমারী স্কুলের গুরুট্রেনিং পাশ মাষ্টার বংশী পরামাণিক নাম দস্তখত করতে শিখিয়েছে। অনেক বুঝিয়েছিল বংশী, মহিন্দর কারো নাম হয় না, ওঠা হবে মহেন্দ্র।*
> *শুনে চটে গিয়েছিল মহিন্দর। বলেছিল, তুমি ইটা কী কহিলেন হে মাষ্টার? বাপ যিটা নাম দিলে, ওইটা বদলামু কেমন করি? হামি মহিন্দর আছিং, মহিন্দর থাকিবা চাহি। বাপের নাম ছাড়িবা কহিছ। কেমন মানুষখানা হে তুমি?"*[৩]

বংশী মাষ্টার যতোই নতুন দিনের আলো নিয়ে আসার চেষ্টা করুক না কেন পুরুষানুক্রমে লালিত সংস্কার মহিন্দর ছাড়তে পারে না, বলা ভাল ছাড়ার সাহস পায় না। যেমন ছিল তেমন থাকাই যেন তার ললাট লিখন- "হামি মহিন্দর আছি, মহিন্দর থাকিবা চাহি।" সে মেনে নিয়েছে, এটাই যেন তার নিয়তি। তার আরও একটি বয়ান একথারই সমর্থন করে-

> *"মহিন্দর আবার বললে, তাই কহিছু; যেমন চলিছে ওই রকমটাই চলিবা দাও।"* [৪]

এই বয়ানটা যদিও সরস্বতী পুজো নিয়ে বংশীমাষ্টারের চাপের পরিপ্রেক্ষিতে করা তবুও অপ্রাসঙ্গিক নয়। উচ্চবর্ণের বাঁধাধরা নিয়মে চলাই যেন নিম্নবর্গের মানুষের অমোঘ নিয়তি। মহিন্দর জানে-

"নাহক ঝামেলা বাড়াই কি ফায়দাহেবে।"[৫]

'জলচল নাপিতের' ছেলে বংশী পরামাণিক হাল ছাড়ার পাত্র নয় কেননা সে তো অনেক লেখাপড়া শিখেছে। "বংশী বললে আমি তো অনেক লেখাপড়া শেখেছি।"[৬] এই বংশী মুচিদের গ্রামের স্কুলের মাষ্টার। সে শুধু মুচিদের বাচ্চাদের পড়ায় না, এই অন্ত্যজদের জীবনে পরির্বতনের সূর্য ওঠাতে চায়। সে স্কুলে সরস্বতী পুজো করতে উস্যোগী হয়। এই কথাটা যখন মুচিপাড়ার সবচেয়ে বিচক্ষণ 'টিপসই' জানা মহিন্দরের কানে বংশীমাষ্টার তুলল, তখম মহিন্দর নিজের কানকেও যেন বিশ্বাস করতে পারলে না। উৎকণ্ঠিত ভাবে বংশীকে সে জিজ্ঞাসা করে-

"কী পূজা করিবা কহিছ?
-সরস্বতী পূজা।
- হায়রে বাপ! ইসব খেয়াল তুমহার কেন হৈল্
মাষ্টার?"[৭]

আমরা লক্ষ্য করলাম মহিন্দরের মনের ভিতরে জমাট বাঁধা ভয়কে। তার হৃদয় আৎকে উঠেছে সামাজিক বাঁধা নিষেধের কথা ভেবে পুজো তো ব্রাহ্মণের একছত্র অধিকার। "ই সব খেয়াল' করাই মহিন্দরের মতো অন্ত্যজদের উচিত নয়। 'ই সব খেয়াল তুমহার কেনে হৈল মাষ্টার' অনেকটা বিদ্রুপের মতো এই বাক্য উচ্চারিত হলো' মহেন্দরের কণ্ঠে। অন্ত্যজ মুচিদের পুজোর কথা ভাবাই উচিত নয়। এটাই মনুবাদী হিন্দুশাস্ত্রের লিখন। মহিন্দর জানে তারা অন্ত্যজ অশুচি তারা ঠাকুর দেবতার পুজো কোনভাবেই করতে পারে না, এটাই সামাজিক বিধান। এমনকি মুচিদের পুজোও ব্রাহ্মণরা করে না। কেননা তারা অন্ত্যজ অশুচি। বংশীর ক্ষুরধার যুক্তির প্যাঁচে মহিন্দর পুজোর কথা মানলেও তার মনে তখনও দ্বিধা পুজোটা করবে কে?

-'থাকো হে মাষ্টার বংশীকে বাঁধা দিলে মহিন্দরঃ
তুমি ঢের নিখিচ, যিটা কহিবা সিটা তো হবে।
কিন্তু পুজা কে করিবে?
-কেন পূজো যে করে?
-কেন বাম্হন্? -মহিন্দর ম্লানভাবে হাসল: ইবারে হামাক তুমি হাসাইলেন হে মাষ্টার। বাম্হনকে চিন নাই।
উয়ারা মুচির পূজা করিবা আসিবে - এমন মানুষ নহ। কহিবা গেলে গালি দি তাড়াই দিবে।"[৮]

মহিন্দরের ম্লানভাবে হাসার মধ্যে তার গভীর মর্মবেদনা ধরা পড়েছে। ব্রাহ্মণ্যবাদী সমাজব্যবস্থায় ব্রাহ্মণেরা মুচির পূজা পর্যন্ত করতে আসে না। পূজার কথা বললে গালি খাবে। অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষের মনে যে যন্ত্রনা তা মূর্ত হয়ে উঠছে এখানে ওরা হিন্দু হয়েও হিন্দু নয়। হিন্দু ধর্মের পুজো পার্বণ করা তাদের এক্তিয়ারে পড়ে না। হিন্দুধর্মের বর্ণভেদ প্রথার এক বাস্তব কুৎসিত দিক চোখে আঙুল দিয়ে ঔপন্যাসিক আমাদের দেখালেন। মহিন্দরের বয়ানে গোটা অন্ত্যজ শ্রেণির মর্মবেদনা বাণীরূপ লাভ করেছে। ব্রাহ্মণ্যতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় অবহেলিত ব্রাত্যজনদের কণ্ঠস্বর ধরা পড়েছে উপন্যাসের বয়ানে। বস্তুতঃ পূজাকে কেন্দ্র করে উপন্যাসে দ্বান্দ্বিক সংঘাত তৈরী হয়। শেষ পর্যন্ত প্রাণ দিতে হয় মুচি সমাজের যোগেন ও মহিন্দরকে।

ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের প্রতাপের কথা মনে করে মহিন্দর পুজোর কথা সরাসরি অস্বীকার করে। ব্রাহ্মণ্যবাদী সমাজ ব্যবস্থায় অন্ত্যজরা কতটুক ব্রাত্য মহিন্দ্রের কথার মধ্যে ফুটে ওঠে এই ছবি-

-"হামরা উসবের মধ্যে নাই। তো কালীপূজা হয়-

ভিনগায়ের সরকার মহাশয়ের নামত সংকল্প করিবা
লাগে ওই হামাদের পূজা-বাস্। ফের যে পূজা
করি সিতো মদ আর হল্লা হয়, এক বামহ্ন
আর কী কামে নাগিবে।"[৯]

নিম্নশ্রেণির মানুষদের সামাজিক বঞ্চনার ছবি ফুটে ওঠেছে এখানে। যুগ যুগ ধরে ভারতবর্ষ তথা বাংলাদেশে এই সামাজিক বৈষম্যের ধারা চলে আসছে। এই সামাজিক বৈষম্যের কথা, বঞ্চনার কথা, অপমানের কথা রবীন্দ্রনাথ 'গীতাঞ্জলির' 'দুর্ভাগা দেশ' কবিতায় উল্লেখ করেছেন –

"হে মোর দুর্ভাগা দেশ, যাদের করেছ অপমান,
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।
মানুষের অধিকারে বঞ্চিত করেছ যারে
সম্মুখে দাঁড়ায়ে রেখে তবু কোলে দাও নাই স্থান,
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।"[১০] *(২০ আষাঢ় ১৩১৭)*

রবীন্দ্রনাথ উদ্দিষ্ট যে নীচুতলার মানুষ তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে চণ্ডাল, মুচি, মেথর, ডোম, শবর এই সমস্ত অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষেরা অবহেলিত হয়ে আসছে। বাংলা সাহিত্যের প্রথম নিদর্শন চর্যাপদেও তার উল্লেখ পাই। 'নগর বাহিরের ডোম্বী তোঁহরী কুটিয়া' এই চর্যায় তার আভাস পাওয়া যায়। আধুনিক কালের উপন্যাস শিল্পী নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'বৈতালিক' উপন্যাসেও নীচুতলার মানুষের জীবনচিত্র চিত্রায়িত হয়েছে। অন্ত্যজ মুচি সমাজের অন্তরের দহন ভাষারূপ পেয়েছে এই উপন্যাসে।

যে সময়ে নারায়ণ এই প্রতিবেদন রচনা করেছেন সে সময়ে তা মোটেই সহজ ছিল না। বিশেষ করে যখন খণ্ডিত স্বাধীনতা এবং স্বাধীনতা পরবর্তী ছিন্নবিচ্ছিন্ন দুই পারের সমাজ জীবন। সে সময়ে কথাসাহিত্যিকদের হাতছানি দিচ্ছিল রাজনৈতিক বা সামাজিক ভাঙাগড়ার প্রতিবেদন রচনা করার। সেই সময় বেশির ভাগ জনপ্রিয় সাহিত্যিকরা যখন এই টালমাটাল পরিস্থিতি নিয়ে কলম ধরেছেন তখন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ভিন্নধর্মী আখ্যান রচনা করলেন। এই আখ্যানে সামাজিক বর্ণ-সংঘাতের বীভৎস রূপকে আমাদের সামনে তুলে ধরলেন।

উচ্চবর্গীয় সমাজের বেঁধে দেওয়া সংস্কারে লালিত হতে হতে নিম্নবর্গীয় সমাজের মানুষের ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গেছে যে তাদের জন্ম পদতলে থাকার জন্য হয়েছে। তথাকথিত উচ্চবর্গীয়দের পদতলে থাকাই তাদের নিয়তি। রুহিদাস পাড়ার তথাকথিত সবচেয়ে শিক্ষিত ছেলে যোগেন। সে 'আলকাপের' গান বাঁধতে পারে। সে যখন স্কুলের মাষ্টার বংশী পরামাণিকের কাছে জানতে পারলে তাদের গ্রামের স্কুলে সরস্বতী পুজো হবে, তখন তার প্রতিক্রিয়া,- উপন্যাসিকের বয়ানে এভাবে ব্যক্ত হয়েছে:-

"- সেখানে সরস্বতী পূজা হবে
বিস্ফারিত চোখে যোগেন তাকিয়ে রইল:
কী পূজা হবে কহিলেন?
- *সরস্বতী।*
- *ইটা ফের কেমন কথা? চামারের গাঁয়ে পূজা?*
- *কেন চামারও তো মানুষ।*

যোগেন বললে, মানুষ হবা পারে,
কিন্ত বামহ্ন কায়থ্ ত নহে। হামরা বামহ্ন কায়থের
জুতার তলা।"[১১]

এই ধারণা শুধু যোগেনের নয়। গোটা অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষেরাই মনে করে তারা 'বামহ্ন কায়থের জুতার তলা' অর্থাৎ 'দলিত'।

বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে মধ্যযুগীয় বর্ণবৈষ্যমের গুটি কেটে সমাজে সামাজিক উদারতা আসার কথা ছিল, কিন্তু তা আসেনি 'বৈতালিক' উপন্যাস তার জ্বলন্ত উদাহরণ। বংশী পরামাণিকের মতো কোন কোন স্বল্পশিক্ষিত মানুষের প্রয়াসে মধ্যযুগীয় বর্ণবাদী জাড্যতায় ঢিল পড়লে উচ্চবর্গীয় সমাজে তখন বিরূপ প্রতিক্রয়া দেখা দেয়। উচ্চবর্ণের জমিদারের নায়ের চট্টরাজ আর দারোগার কথোপকথনেই এই বিরূপ প্রতিক্রিয়ার স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়-

"দারোগা বিস্মিত হয়ে বলল, জানেন না? আপনাদেরই পরব।
পরশু বোধহয় সরস্বতী পূজা। ওদিকে কোথায় একটা পূজো হছে
তারই আয়োজন।
-সরস্বতী পূজো? ও:...
-যতসব কাণ্ড! – বিরক্ত উত্তেজিত গলায় চট্টরাজ বললেন এই মুচি শালারা আজকাল যেন মাথায় চড়ে বসেছে। না মানে দেবতাকে না ভক্তি আছে ব্রাহ্মণে। এমন আস্পর্দা যে সরস্বতী পূজো করতে চায়। ওই চামার হাটির হারামজাদাদের একটু শিক্ষা দেওয়া দরকার।
- হুঁ
- চট্টরাজ চটে গিয়ে বললেন। যদি সত্যিই পূজোর ধাষ্টামো করে তাহলে এমন ধোলাইয়ের ব্যবস্থা করব যে, কোনদিন ভুলবে না।" [১২]

করলেনও তাই। রুহিদাসরা বংশী পরামাণিকের উৎসাহে সরস্বতী পুজো করলে তাদের উপর চট্টরাজের অমানবিক নির্যাতন নেমে আসে। সরস্বতী পুজোর দিনে মুচিপাড়ার সবাই যখন উৎসবের আনন্দে উদ্বেল ঠিক তখন নায়ের চট্টরাজ দারোগাকে সঙ্গে নিয়ে কাছারিতে ডেকে পাঠান রুইদাস পাড়ার মাতব্বর মহিন্দর রুহিদাসকে। দুঘণ্টা পর যখন সে ফিরে এলো তখন তার অবস্থা ঔপন্যাসিকের বয়ানে এভাবে তুলে ধরা হয়েছে-

"দারোগার দলটার সঙ্গে প্রায় দুঘন্টা পরে ফিরল
মহিন্দর / নাকে খত দিয়ে উড়ে গেছে নাকের ছাল,
পিঠে জুতোর দাগ লাল টকটকে হয়ে আছে। সাময়িক উৎসাহে
-যতখানি ফেঁপে উঠেছিল, ঠিক সেই পরিমাণেই ফেঁসে গেছে অবলীলাক্রমে। সত্যি কথাই বলেছিল চট্টরাজ মুচির উপযুক্ত জায়গা হচ্ছে জুতোর তলা, বাড়াবাড়ি করলে যা হয় সেটা সুখের অবস্থা নয়। চর্মে এবং মর্মে কথাটা এখন ভালোভাবেই অনুভব করেছে মহিন্দর।" [১৩]

আমাদের বুঝতে বাকি রইল না, পুজো করার অপরাধে রুহিদাস সমাজের প্রতিনিধি মহিন্দরকে উৎপীড়িত হতে হলো। এপ্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি বক্তব্য প্রাসঙ্গিকবোধে উদ্ধৃত হলো।-

"লাখি ঝাঁটা বর্ষণের মধ্যেও তাঁরা স্বধর্ম রক্ষা করতে কুন্ঠিত হয় না। তারা যে কোন কালে সম্মানের দাবি করেনি, পায়ওনি তারা কেবল শূদ্রধর্ম অত্যন্ত বিশুদ্ধভাবে রক্ষা করেই কৃতার্থ মনে করেছে। আজ যদি তারা বিদেশী শিক্ষায় মাঝে মাঝে আত্মবিস্মৃত হয় তবে সমাজপতি তাদের স্পর্ধা সম্পর্কে আক্রোশ প্রকাশ করে।" [১৪]

(৩)

'বৈতালিক' উপন্যাসে নির্যাতিত অন্ত্যজদের কণ্ঠে ক্ষীণ প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে। বংশীপরামাণিকের প্রচেষ্টায় মূক মুখে প্রতিবাদের গান উঠেছে। রুহিদাস সমাজের নতুন কবিয়াল যোগেনের 'আলকাপ গান' তাই শেষ পর্যন্ত প্রতিবাদের গান হয়ে ওঠে। পুজো উপলক্ষে বংশীপরামাণিক আলকাপ গানের আসর বসায়। সেখানে গান ধরে যোগেন-.

"মহাজন রক্ত চোষা
জমিদার ফোঁস মনসা
দারোগা যে লাটের ছাওয়াল
মোদের হৈল কাল।"[১৫]

এ গান যোগেনের নিজের লেখা গান 'এ গানে ধ্বনিত হয়েছে উচ্চবর্গীয় মানুষের নির্যাতনের কথা। শুধু শোষণ আর নির্যাতনের কথা বলেই যোগেন থেমে যায়নি। প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে গানের পরবর্তী কলিতে-

"বাঁচার নামে বিষম জ্বালা
পরাণ হৈল ঝালাপালা
ওই তিনটা শালাক মারি খেদাও
ঘুচুক এ জঞ্জাল-।"[১৬]

স্পষ্টতই বিদ্রোহের সুর। ওরা জেগে ওঠেছে। অন্ত্যজদের জাগিয়ে তুলেছে 'বৈতালিক' যোগেন। সে জন্য তাকে চরম মূল্য দিতে হলো। তার ফলস্বরূপ হাতকড়া পড়ল যোগেনের হাতে। মার পড়ল যোগেনের ওপর:-

"যোগেনের মুখের ওপর হিংস্র ক্ষিপ্ত দারোগার কিল চড় পড়েছে, সর্বাঙ্গে পড়ছে চট্টরাজের লাথির পর লাথি। যোগেন তখন আর গান গাইতে পারছে না, মুখ দিয়ে গোঁ গোঁ করে যন্ত্রণার কাতর গোঙানির মতো অদ্ভুত আওয়াজ বেরচ্ছে একটা। নাক আর গলার পাশ দিয়ে তার গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে রক্তের ধারা। যোগেন তবু থামতে চায় না- পাগল হয়ে গেল নাকি?"[১৭]

কীভাবে থামবে যোগেন? তার তো পাগল হয়ে যাবারই কথা। বহুদিনের জমানো ক্ষোভ আর অপমান বাঁধ ভেঙে বেরিয়ে আসতে চায়। নীচুতলায় জন্মেছে বলে বার বার অপমানিত হয়েছে। মানুষের মর্যাদা পায়নি তা সে। বংশী পরামানিক যোগেনকে তার নিজস্ব সত্ত্বার সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে। চোখ খুলে গেছে যোগানের। যে এখন আর মুখ বুঝে থাকবে কেন? তাই মায়ের জন্য ঔষধ আনতে গিয়ে ডাক্তারের কোয়ার্টারে অপমানের বদলায় পাল্টা দিয়ে এসেছে যোগেন, ডাক্তারের ঘরে জল খেতে চাইলে ডাক্তারের অষ্টাদশবর্ষী যুবতী মেয়ে যোগেনকে জল দিতে এলে ডাক্তার তার মেয়েকে যোগেনের ছোঁয়াছুয়ি থেকে দূরে থাকতে বললেন–

"ডাক্তার হঠাৎ গর্জে উঠলেন।
ভেঙে পড়লেন বাজের আওয়াজের মতো
-হাতে জল ঢেলে দে ওর।
ও ব্যাটা মুচি, ঘটি ছোঁবে কেমন করে
- মুচি? - মেয়েটি এগিয়ে আসছিল,
সঙ্গে সঙ্গে পিছিয়ে গেল তিন পা।"[১৮]

মানব ধর্মের চরম অপমান হতে এখানে দেখলাম আমরা। মুচি যেন মানুষ নয়। তাদেরকে ছুঁতে নেই। বর্ণের আভিজাত্যে একশ্রেণির মানুষ এভাবে যুগ যুগ ধরে অপমান করেছে অন্ত্যজশ্রেণির মানুষদের। নতুন সময় সমাগত সেকারণে যোগেন ও অপমানিত হয়ে মুখ বুজে সহ্য না করে পাল্টা অপমানের পথে হাঁটল—

> *"আর পিছিয়ে গেল যোগেনও। তীব্র গলায় বললে ভদ্দর লোকের ছোঁয়া জল হামরা খাইনা বাবু, জাতি যায়, -তার পরেই সোজা উল্টো দিকে মুখ ঘুরিয়ে দ্রুত হাঁটতে শুরু করলে।"* [১৯]

উচ্চবর্গীয়দের গালে চেপ্টাঘাত করে নিম্নবর্গীয়রা যে স্রোতের বিপরীতে হাঁটতে শুরু করেছে এখানে তার স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া গেল। সমাজ পরিবর্তনের আভাস সূচিত হলো যেন। রবীন্দ্রনাথ কথিত "শতেক শতাব্দী ধরে নামে শিরে অসম্মানের" জ্বালা বহন করে চলছিল তারা এবার উল্টো দিকে হাঁটতে শুরু করল। যোগেন তাদের প্রতিনিধি।

উপন্যাসের সমাপ্তি বিন্দুতে এসে নতুন দিনের পূর্বাভাস পাওয়া গেল। যোগেন আর মহিন্দরের আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে অন্ত্যজদের মনে সাহস সঞ্চার হলো- মুক্তির আকাঙ্ক্ষা দেখা ছিল। মহিন্দরের মাথায় লাঠির আঘাত লাগে।

> *"আর চড়াৎ করে ফেটে গেল খুলিটা, খানিকটা রক্ত ছুটে গিয়ে দেবী প্রতিমার শুভ্রতার ওপরে লালের ছোপ ধরিয়ে দিলো।"* [২০]

দেবী প্রতিমার ওপর রক্ত পড়ে যে দাগ লাগলো সে দাগ অনেকার্থদ্যোতক। আর এই সমস্ত ঘটনা দূরে দাঁড়িয়ে পর্যবেক্ষণ করছিল হারাণ, সেও বঞ্চিত, অবহেলিত বর্গের একজন, সে কিন্ত ভয় পেয়ে পালিয়ে গেল না বরঞ্চ আগামী দিনের জন্য শক্তি সঞ্চয় করল, উপন্যাসিকের বয়ানে-

> *"...ভয় পেয়ে পালায়নি, নড়েনি এক পাও। সে হারাণ*
> *তার গলায় গান নেই, সে শুধু ঢোল বাজাতে পারে।*
> *সে ঢোলের ছাউনি সে নিজের হাতে ফাঁসিয়েছে।*
> *এবার নতুন করে ঢাকে ছাউনি দেবে সে যে গান গাইতে পারেনি,*
> *ঢোলের বুলিতে তাকে সে মুখরিত*
> *করে তুলেবে। উপাসুদের ঘর ভেঙে দেবার জন্য নয়*
> *নতুন করে আবার তাদের ঘর গড়ে তোলবার জন্য।"* [২১]

নতুন দিনের স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া গেল। সমাজের একেবারে নীচুতলার মানুষেরা জেগে ওঠার রসদ পেয়ে গেছে, এবার তাঁরা নতুন করে বাঁচতে শিখবে, এই আশা নিয়ে উপন্যাসের আপাত সমাপ্তি সূচিত হয়।

'বৈতালিক' উপন্যাস বাংলা সাহিত্যর এক উজ্জ্বল পাণ্ডুলিপি। এই উপন্যাসে অন্ত্যজ মুচিদের জীবনের চালচিত্র ধরা পড়েছে। তাদের নিজস্ব লোকায়ত জীবন, তাদের সংস্কৃতি, তাদের প্রতিদিনের হাসিকান্নার জীবন, তাদের প্রেম, ভালবাসা, পাওয়া নাপাওয়া, তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক, রীতি-নীতি, আচার আচরণ সমস্ত কিছুই উঠে এসেছে সাবলীল ভাবে। সর্বোপরি চিত্রায়িত হয়েছে উচ্চবর্গ ও নিম্নবর্গের দ্বান্দ্বিক সংঘাত। বাংলা সাহিত্যের উপন্যাসবিশ্বে নারায়ণ গঙ্গোপাধায়ের 'বৈতালিক' নিঃসন্দেহে কালজয়ী হওয়ার দাবী রাখে।

১. তথ্যসূত্র :

১. গঙ্গোপাধ্যায় নারায়ণ - 'বৈতালিক', ভূমিকাংশ'
২. তদেব পৃ: ১.
৩. তদেব পৃ: ১.

৪. তদেব পৃ: ২৭.
৫. তদেব পৃ: ২৭
৬. তদেব পৃ: ২৮
৭. তদেব পৃ: ২৬
৮. তদেব পৃ: ২৭
৯. তদেব পৃ: ২৭.
১০. ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ 'দুর্ভাগাদেশ' 'গীতাঞ্জলি'
১১. গঙ্গোপাধ্যায় নারায়ণ 'বৈতালিক' পৃ: ৬৫.
১২. তদেব পৃ: ১৬৩-৬৪.
১৩. তদেব পৃ: ২০৩.
১৪. রবীন্দ্র রচনাবলী (শতবার্ষিকী সংস্করণ) ১৩শ খণ্ড পৃ: ৩২৫.
১৫. গঙ্গোপাধ্যায় নারায়ণ 'বৈতালিক' পৃ: ২০৫
১৬. গঙ্গোপাধ্যায় নারায়ণ 'বৈতালিক' পৃ: ২০৫
১৭. তদের পৃ: ২০৬
১৮. তদের পৃ: ১৯৬
১৯. তদেব পৃ: ১৯৭.
২০. তদেব পৃ: ২০৬
২১. তদেব পৃ: ২০৬

২. আকর গ্রন্থ :

ক. 'বৈতালিক' - নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় – বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলকাতা – ১২

৩. সহায়ক গ্রন্থ:

ক. 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস' – ড. দেবেশ কুমার আচার্য - ইউনাটেড বুক এজেন্সি ২৯/১ কলেজ রোড, কলকাতা – ৭০০০০৯।
খ. 'মধ্যাহ্ন থেকে সায়াহ্নে'- অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় – দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা – ৭০০০৭৩।

৪. ইন্টারনেট: http://bn.m.wikipedia.org/wiki.